শিশু অপরাধ ও অপরাধী

অধ্যাপক প্রমদানাথ চৌবে

শিশু লালনী গ্রন্থমালা

বাবা-মারা সকলেই প্রতিনিয়ত শিশুকে গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করছেন কিন্তু তাঁদের চেষ্টা-যত্ন সত্ত্বেও প্রায়ই তাঁরা ছোটদের নিয়ে নানান মুস্কিলে পড়েন—এ নিয়ে তাঁদের মনে নানান জিজ্ঞাসাও জাগে। বাস্তবিকই ছোটদের মনকে খুব ছোটবেলা থেকে ঠিক মত বুঝতে ও পরিচালিত না করতে পারলে, পরবর্তীকালে বাবা-মাদের নানান অসুবিধায় পড়তে তো হয়ই—তা ছাড়াও মনোবিজ্ঞানিরা বলেন, বয়স্কদের মধ্যেও সময় সময় যেসব মানসিক ব্যাধি দেখা যায়, তারও মূল নিহিত থাকে, শিশুকালে মন তার সহজ গতিতে বিকাশ লাভ না করতে পারার মধ্যে। কাজেই শিশুদের সেই বহুবিচিত্র মনের ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অভিভাবকরা যাতে ছোটদের স্বাধীন দেশের উপযোগী সুস্থ ও সবল-মনা প্রয়োজনীয় নাগরিক করে গ'ড়ে তুললে পারেন, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে, শিশু লালন ও পরিচালন সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করে, এই পুস্তিকামালা প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে।

শিশু মনোবিজ্ঞানের মতন একটি জটিল বিষয়কে যাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আপন রচনা সম্ভারে সহজ ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার ভার নিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নেই—তাই আশা করি শিশু ও কিশোর কল্যাণকামী মাত্রেই এই প্রচেষ্টাকে সমাদৃত করে তাঁদের সমাদর করবেন।

সম্পাদক

শিশুলালনী গ্রন্থমালা ঃ পঞ্চম পুস্তিকা

শিশু অপরাধ ও অপরাধী

অধ্যাপক প্রমদানাথ চৌবে

কিশোর কল্যাণ কেন্দ্র

হাওড়া

ভূমিকা

শিশু অপরাধ আমাদের সমাজ-জীবনের একটি গুরুত্বপুর্ণ সমস্যা। যে সকল শিশুর মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দেখা যায়, পরিণত বয়সে সাধারণতঃ তারাই মারাত্মক সমাজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। মনোবিজ্ঞানী ও অপরাধতত্ত্ববিদেরা বিশ্বাস করেন যে, শৈশবের অপরাধ প্রবণতার অঙ্কুর বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংগঠিত প্রচেষ্টার দ্বারা দুর করা সম্ভব। গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দেখা যায় শিশু অপরাধীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কোন সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তি এই ক্রমবর্দ্ধমান সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্যাটা যেরূপ জটিল ও বিশাল সেই তুলনায় এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে বিশেষ কোন আলোচনা হয়নি বললেই চলে। সেই মূল্যবান আলোচনার সূত্রপাত হিসাবেই আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি প্রকাশ করছি। মাত্র কয়েকখানি পাতার মধ্যে এতবড় একটি সমস্যার আলোচনা করবার চেষ্টা অনেকের কাছেই দুঃসাহস বলে মনে হ'তে পারে। আমার এ-দুঃসাহসের পিছনে র'য়েছে বন্ধু-বান্ধব ও এ বিষয়ে আগ্রহশীল ব্যক্তিদের উৎসাহ ও তাগিদ। পুস্তিকাখানি জনসাধারণের মধ্যে যদি শিশু অপরাধ সমন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারে তাহ'লে আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

কলিকাতা
৩০শে এপ্রিল, ১৯৫২ সাল।

প্রমদানাথ চৌবে

শিশু অপরাধ ও অপরাধী

শিশু অপরাধ বলতে আমরা কি বুঝি ?

সব শিশুই কিছু-না-কিছু দুষ্টুমি করে থাকে কিন্তু শিশুর সকল দুষ্টুমিকেই অপরাধ বলা যায় না। সাধারণ শিশুর দুষ্টুমিকে সাধারণ ভাবে খেলার পর্যায়ে ফেলা যায় এবং শিশুর জীবনে তার বিশেষ দরকারও আছে। কারণ ঐ সকল অভিজ্ঞতা থেকেই শিশু দুনিয়াকে দেখতে শেখে ও চলার পথ বেছে নেয়।

তাহলে আমাদের জানতে হবে, শিশুর কোন্ দুষ্টুমিগুলোকে তার স্বাভাবিক দুষ্টুমি বলব এবং কোন্‌গুলোকে শিশু-অপরাধ বলে গণ্য করব আর প্রতিকারেরই বা উপায় কি ?

এই আলোচনা সুরু করবার আগে শিশু মনের গঠন সম্পর্কে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। কারণ, তা না বুঝলে আমাদের বিচার করতে কষ্ট হবে যে কেন শিশু অপরাধ করে ? তাছাড়া শিশুর অপরাধের প্রতিকারের পথও আমরা খুঁজে পাব না।

শিশু যখন জন্মায় তখন সে সামাজিক জীব হয়ে জন্মায় না, সে কতকগুলি সহজাত বৃত্তি নিয়ে আসে এই পৃথিবীতে। তখন সে সমাজের কোন ধারই ধারে না। অন্য জিনিষের কথা ত দূরে থাকুক এই সময় এমন কি সে মাকেও চেনে না। তার ভাল-লাগা বা মন্দ-লাগার একটা অনুভূতি থাকে মাত্র কিন্তু কিসে তার ভাল লাগে এবং কেন ভাল লাগে সে জ্ঞান তার থাকে না। তাই সে খাদ্য অখাদ্য বিচার না করে যা পায় মুখে দেয় ; এমন কি আগুন দেখলে তাতে হাত দিতেও দ্বিধা বোধ করে না। তারপরে সে দেখতে শেখে তার মাকে। দেখে যে, ভাল-লাগাটা মার কাছে থেকেই বেশী আসে এবং মন্দ-লাগা থেকেও মা-ই তাকে রেহাই দেয়।

পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে সে ঠেকে এবং ঠেকে শেখে—কত ঝড়-ঝাপ্ টাই না তার মাথার উপর দিয়ে যায়। ক্রমশঃ ভাল-লাগার বস্তুর পার্থক্য সে বুঝতে শেখে। মনে রাখতে হবে, বর্বর হ'য়ে সে জন্মেছে এবং মানুষের বর্বর যুগ থেকে আধুনিক সভ্য-যুগের এই বহু হাজার বছরের সামাজিক বিবর্তন তাকে কৈশোর কালের মধ্যেই আত্মস্থ করে নিতে হয়। তাই কৈশোর অবস্থায় তার কাজ কর্ম বা আচরণে কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় এবং তা দেখা গেলেই তাকে অপরাধ বলে গণ্য করা চলে না।

সকলেই হয়ত খেয়াল করেছেন যে, শিশুর দুষ্টুমি তার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে যেতে থাকে এবং তার প্রকৃতিও বদলে যেতে থাকে। যে-সহজাত বৃত্তিগুলি শৈশবে তার সব কাজকে পরিচালনা করেছে একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, কৈশোরে সেগুলির প্রাবল্যও অনেক কমে গেছে এবং রূপও বদলে গেছে অনেক।

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ব্যবহারের ত' পরিবর্তন হ'চ্ছেই না, উল্টে সেগুলি বিকৃত ও প্রবলতর হয়ে উঠছে এবং কখনও কখনও মারাত্মক ভাবেও দেখা দিচ্ছে। দেখা যায়, এই সব শিশু অভিজ্ঞতা থেকে বিশেষ কিছুই সঞ্চয় করতে পারে নি এবং বিচার বুদ্ধিও তার এমন কিছুই বিকাশ লাভ করে নি—সহজাত প্রবৃত্তিগুলি তখনও তাকে আগের মতই চালিত করছে অর্থাৎ বয়স বাড়লেও তার চরিত্রের উন্নতি পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না। এই রকম দেখলে বুঝতে হবে, কোথাও কিছু একটা গলদ আছে।

এই গলদের সন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, তা' বিভিন্ন কারণে হ'য়ে থাকে। যে-সহজাত বৃত্তিগুলি নিয়ে সে জন্মেছে, সেগুলি যদি ঠিকমত বিকাশলাভ না করতে পারে তবেই শিশুর চরিত্রে গলদ দেখা দেয়। মনে রাখতে হবে, সহজাত বৃত্তিগুলি কখনও মরে না, রূপ পাল্টায় মাত্র। রূপ পাল্টায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণে এবং শিক্ষার

গুণে। এই রূপ-পাল্টানো যদি ঠিকমত হয়, তবেই শিশু সমাজের কল্যাণে আসে। শিশুর এই বৃত্তিগুলিকে সহজ ও সুষ্ঠুভাবে বিকাশ লাভ করতে না দিয়ে যদি অন্যায় কড়া শাসনে সেগুলিকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে পরে তারা বিকৃতভাবে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরোবার পথ খুঁজে নেয়—কারণ সহজভাবে সদর দরজা দিয়ে তাকে বেরোতে দেওয়া হয়নি। তাই শিশু অপরাধ করে, সমাজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত হয় এবং কড়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তার সেই সব সমাজ-বিরোধী কাজকে শিশু-অপরাধ বলা হয়।

শিশু-অপরাধ কি জন্মগত না সমাজসৃষ্ট ?

এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, শিশু অপরাধী আমরাই তৈরী করি, এবং শিশু যে অপরাধ করে, তার জন্য আমরাই দায়ী—অপরাধী হয়ে কোনও শিশু জন্মায় না। সহজাত বৃত্তিগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে যে কোন রূপ নিতে পারে। রত্নাকর দস্যুর মহাকবি বাল্মীকি হওয়ার কাহিনী আমরা সকলেই জানি, কিন্তু কখনও তলিয়ে দেখিনি কেমন ক'রে এটা সম্ভব হ'ল। মহর্ষির ছেলে হওয়া সত্ত্বেও রত্নাকর দস্যু হ'য়েছিল, কিন্তু পরে সামাজিক আঘাতে ও প্রেমের স্পর্শে সে হ'য়ে দাঁড়াল প্রেমের কবি বাল্মীকি। আমরা কখনও কখনও দেখি, খুব উচ্চশিক্ষিত ও চরিত্রবানের ছেলে খারাপ হয়ে গেছে—দেখে আমরা আশ্চর্য হ'য়ে যাই। একটু খোঁজ নিলেই আমরা দেখতে পাব, উচ্চ শিক্ষিত হলেও ছেলেকে গ'ড়ে তোলবার শিক্ষা তাঁর নাই। দেখা যাবে, ছেলেকে একটা কাল্পনিক বিশেষ-কিছু ক'রে বানানোর ইচ্ছায় তিনি হয় কড়া শাসন করেছেন এবং ছেলেকে নিজে মনে ক'রে তার উপরে বড় বড় নৈতিক ও অন্য শিক্ষার বোঝা চাপিয়ে অথবা অত্যধিক আহ্লাদ দিয়ে তার মাথা খেয়েছেন। তার নিজেকে নিজে গড়ার স্বাধীনতা ও সুযোগ দেওয়া হয়নি। ইহুদীরা

যেমন নিরীহ ছাগলের উপরে নিজেদের পাপ চাপিয়ে দিয়ে তাকে বলি দিয়ে কিম্বা জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়ে পাপমুক্তির আত্মপ্রসাদ লাভ করে, আমরাও ঠিক তেমনি নিজেদের দোষ ও অপরাধ নিরীহ শিশুর উপরে চাপিয়ে তাকে সমাজের বাইরের জীব আখ্যা দিয়ে নিজের 'মনুষ্যত্ব অর্জনে'র তৃপ্তি করে থাকি। শিশুকে গড়ে তোলার জন্য অভিভাবকের যে-শিক্ষার প্রয়োজন, আমাদের মধ্যে সচরাচর তার এতই অভাব দেখা যায় এবং পারিপার্শ্বিক সামাজিক ব্যবস্থার এতই গলদ আছে যে, প্রায় সব শিশুই যে কেন অপরাধী হয়ে ওঠে না আশ্চর্য। দেখে মনে হয়, শিশুদের ভেতরে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থেকে বাছাই করে নেওয়ার এবং তার স্বাভাবিক বিকাশ লাভের পরিপন্থী অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার একটা প্রেরণা আছে।

এই প্রেরণাকে জাগিয়ে তোলাই আমাদের কাজ। অনেকের ধারণা আছে, অনেক শিশু এমন মনের গঠন নিয়েই জন্মায় যে, যত শিক্ষাই তাদের দেওয়া হোক না কেন এবং পারিপার্শ্বিককে যতই অনুকূল করে তোলা যাক না কেন তারা অপরাধী না হয়েই পারেনা। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানী, ও অপরাধ-বিজ্ঞানী বিশেষ করে শিশু-অপরাধ বিশেষজ্ঞরা একথা মানেন না এবং এর জন্য প্রচুর তথ্য উপস্থিত ক'রে না-মানার অকাট্য যুক্তিও তাঁরা দেন। জন্মগত অপরাধী-শিশু বলে যদি কিছু থাকতো তা'হলে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া ও অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্থষ্টি করে প্রায় সব অপরাধী শিশুকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যেত না। অথচ দেখা গেছে, যে ছেলে ক্রমান্বয়ে অবাঞ্ছিত আচরণ করেই যাচ্ছে— বাধা দিলে কিছুতেই বাধা মানে না এবং এত দুর্দান্ত যে কেউ তাকে বাধা দিতেও সাহস করেনা, এরকম শিশুও উপযুক্ত অবস্থা এবং শিক্ষার ফলে পুর্ণাঙ্গ নাগরিক হ'য়ে উঠেছে এবং বহু জনহিতকর কাজও করেছে। তবে এও দেখা যায় যে, এমন অনেক অপরাধী-শিশু আছে, যারা স্বল্পবুদ্ধিপরায়ণ অথবা মৃগীজাতীয় রোগে ভুগছে, তাদের

শিক্ষার ফলে বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। কিন্তু এদের ক্ষেত্রেও বিশেষ ক'রে শিক্ষা দিলে ও নিয়মিতভাবে বহুকালধরে ঠিকমত ঔষধ খাওয়ালে, কি হয় বলা যায় না।

শিশু কেমন করে অপরাধী হয়

বোঝা গেল যে, সহজাত বৃত্তিগুলির সহজ ও স্বাভাবিক রূপ বদলানোর মধ্যে দিয়ে সেগুলির এমন সার্থক উৎকর্ষ দেখা দেয় যে, পরে তাদের চেনাই যায় না। এই উৎকর্ষের পথে বাধা সৃষ্টি হলে তবেই বৃত্তিগুলি বিকৃত ও মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। বাধা হতে পারে :

(১) অর্থনৈতিক দুরবস্থা। বাড়ীর অবস্থা যদি এতই খারাপ হয় যে, সাধারণভাবে খাওয়া-পরা চলে না, তবে শিশুকে সমাজ-বিরোধী পথে তা' সংগ্রহ করতে হ'তে পারে। শিশুর যে সব জিনিষ পেতে ইচ্ছে হয়, সেগুলি বাপ-মার কাছ থেকে না পেলে সে চুরি করা শিখতে পারে।

(২) সামাজিক চাপ। শিশুদের স্নেহ ভালবাসা পাওয়া একান্ত দরকার। বাপ-মা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে তা' না পেলে, তাদের প্রতি তার একটা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং শিশুর অপরাধজনক কার্যাদির মধ্যে দিয়ে তা' প্রকাশ লাভ করতে চেষ্টা করে।

(৩) নিজের সম্পর্কে হীনতাবোধ। শিশুর সব সময় ইচ্ছা হয়, 'আমি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠি'—বাবার মত বড় হবার ইচ্ছা তার মনে সব সময় প্রবল। তার ইচ্ছা, সকলে তার পরামর্শ নিয়ে চলবে, বিশেষ করে মা। তা যখন হয় না, তখন তার মনে দুঃখ হয়—নিজের সম্পর্কে হেয় ধারণা হয়। এই হেয় ধারণা কাটানোর জন্য এবং নিজেকে বড় প্রমাণ করার জন্য শিশু অপরাধ করে।

(৪) শিশু-মনে অহংবোধ। বয়সের সাথে সাথে শিশুর

মনে অহংভাব বেড়ে উঠতে থাকে। এই অহং-এর কোন সংযম তার থাকে না বলে পদে পদে তা বাধা পেয়ে খর্ব হবার অবস্থা হয়। সে মনে করে যা খুশি সে করতে পারে। তা যখন হয় না, তখন তার নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা ক্ষুণ্ণ হয় এবং অহং অপমানিত বোধ করে। তখন অপরাধ ক'রে শিশু তার মনকে বোঝায়, তার অহংকে চরিতার্থ করার চেষ্টা করে।

(৫) শিশু-মনের ন্যায়-অন্যায়বোধ। অহং যত বেড়ে উঠতে থাকে, ততই শিশুর মনে ন্যায়-অন্যায় বোধ জন্মাতে থাকে। মনের অন্যায় বোধের দরুন সে শাস্তি নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় এবং সেইজন্য অপরাধ করে। শিশু নিজে ইচ্ছে করে শাস্তি নিতে চায় কথাটা শুনলে বিশ্বাস করতে স্বভাবতঃই ইচ্ছে হয় না। কিন্তু শিশুর মনঃসমীক্ষণ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও তার আঁকা ছবি থেকে জানা যায় যে, তার মনের অন্তর্নিহিত কোণে শাস্তি পাবার বাসনা আছে।

(৬) বুদ্ধির স্বল্পতা ও বিশেষ ধরনের রোগ। স্বল্পবুদ্ধি-পরায়ণ ও মৃগীরোগগ্রস্ত শিশুকেও অনেক ক্ষেত্রে অপরাধ ক'রতে দেখা যায়। শিশুকাল থেকেই আমাদের মনে এমন অনেক ইচ্ছা জন্মায় যা' চরিতার্থ করা চলে না। সমাজের দিকে তাকিয়ে অনেক ইচ্ছাই আমাদের চাপতে হয়। এ কাজ করে আমাদের অহং এবং মগজ। মগজে কোন গোলমাল থাকলে ঐসব ইচ্ছা ঠিকমত চাপা হয় না। ফলে শিশু অপরাধ করে।

তাহলে এখন প্রশ্ন ওঠে যে, যে-ছেলেটা অপরাধ করেছে সে স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক তা জানবার উপায় কি? মৃগী রোগের জন্য অস্বাভাবিক হ'য়ে থাকলে তা' সহজেই বোঝা যাবে। কিন্তু অপরাধী শিশু স্বল্পবুদ্ধিপরায়ণ কি না তা কেমন করে জানা যাবে?

প্রায় ৪০ বছর ধ'রে মনোবিদরা শিশুর বুদ্ধি ও অন্যান্য

ক্ষমতাকে পরিমাপ ক'রে কোন্ শিশু স্বাভাবিক আর কোনটি অস্বাভাবিক তা' বের করার এক পন্থা আবিষ্কার করেছেন। নানারকম প্রশ্নাবলীর সাহায্যে তাঁরা শিশুর বুদ্ধি পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন। সেই সব প্রশ্নাবলী নিয়ে কোন শিশুকে পরীক্ষা করলে অনেকটা নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে শিশু সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন কিনা অথবা তার চাইতে উঁচুদরের বা নীচুদরের। এই সব প্রশ্নাবলী ছাড়াও আরও অনেক প্রকার প্রশ্নাবলী তাঁরা ব্যবহার করেন শিশুর ব্যক্তিত্ব, প্রক্ষোভ, চরিত্র প্রভৃতি নির্ধারণ করার জন্য।

এর সঙ্গে জানা দরকার শিশুর ছোটবেলার ইতিহাস তার বংশ-পরিক্রমা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা। কারণ আমরা জানি যে, ছোটবেলার অর্থাৎ পাঁচ ছয় বৎসর পর্যন্ত শিশুদের দেহের ও মনের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিলে খুব কম শিশুই পরে রুগ্নমনগ্রস্ত হয়ে উঠে।

শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর সামাজিক প্রভাব

এই সব পরীক্ষা থেকে যে-অপরাধ-প্রবণ শিশুকে বুদ্ধির দিক থেকে স্বাভাবিক বলে বোঝা যাবে, তাকে শোধরাবার আগে, তার ব্যক্তিত্বের গলদটা কোথা থেকে কিভাবে এসেছে, তা বুঝে নেওয়ার জন্য তার সামাজিক পারিপার্শ্বিকটা ঠিকমত দেখে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। দেখা দরকার, তার বাড়ীর সাধারণ আবহাওয়া কেমন, তার বাপ মা কি ধরনের লোক, বাড়ীর আর্থিক অবস্থা কেমন, বাড়ীর কে কিভাবে রোজগার করেন, অবসর সময়ই বা তাঁরা কিভাবে কাটান, শিশুর সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেকের সম্পর্ক কি এবং ভালবাসা কতখানি, বাড়ীতে কি জাতীয় আলাপ-আলোচনা বেশী হয় এবং শিশুরা ঐ আলোচনায় যোগ দেয় কি না—এসব তথ্য খুঁটিয়ে জেনে নেওয়া দরকার। তাছাড়া শিশুর সঙ্গীসাথীদের সম্পর্কের বিশদভাবে জানা দরকার। মনে রাখতে হবে স্কুলের মাষ্টাররা ও সহপাঠীরাও শিশু-চরিত্রকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে।

শিক্ষা পদ্ধতির গলদে শিশু চরিত্র বিকৃত হয়

আমরা সাধারণতঃ ছেলেদের ইস্কুলে পাঠাই কয়েকটা পাশ করে যাতে সে চাকরী করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ; আর দুপুর বেলায় দুষ্টুমি ক'রে মাবৃ দ্বিপ্রহরিক নিদ্রায় ব্যাঘাত করে ব'লে। সেইজন্য স্কুলগুলি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ছেলেদের কাছে কয়েদখানা। কড়া সেখানে শাসন—শিশু-স্বাধীনতার বালাই নাই। বইগুলিও নিরস নীতিকথায় ভর্তি। কল্পনা বা অন্যরূপ আকর্ষণ তার মধ্যে নেই বললেই হয়। স্বল্পবেতনের মাষ্টাররা তাঁদের সমস্ত জীবনের বিরক্তি ও সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এনে ঝাড়েন নিরীহ শিশুদের উপর—এ ছাড়া অন্য কিছু তাঁদের কাছে আশাও করা যায় না। নিরস বইগুলি আরও নিরস করে তাঁরা পড়ান—যেন রস নিঙড়ে নেওয়া আখের ছিবড়ে তাদের চিবোতে দেওয়া হয়, তাও আবার বেত উঁচিয়ে। এই পারিপার্শ্বিক স্বভাবতই শিশুর মন বিদ্রোহ ক'রে বসে। সে ইস্কুল পালাবার কায়দা কানুন আয়ত্ত করতে থাকে। মিথ্যে কথা বলে ধরা পড়লে, ইস্কুলকে ভয়াবহ স্থান মনে ক'রে সে ঢিল ছুঁড়ে দরজা জানালা ভাঙ্গার চেষ্টা করে। সুযোগ পেলেই মাষ্টারদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে অত্যাচার করে তাঁদের ওপর। কোন ছেলে বলে দিলে, তাকে মারধোর করে। ইস্কুল পালিয়ে বদসঙ্গে মেশে এবং কিছু কিনতে ইচ্ছা হ'লে পয়সা না থাকলে চুরি করে। ক্রমশঃ একেবারে গুণ্ডা প্রকৃতির হ'য়ে যায়। পড়াশুনা একেরারে না হওয়ায় পরীক্ষায় পাশ করার জন্য নকল করে, কারণ পাশ না করলে বাড়ীতে বিপদ আছে। মাষ্টার পাশ নম্বর না দিলে তাঁকে মারবে ব'লে শাসায় এবং কখনও কখনও মারধোরও করে।

এত গেল সাধারণ সেই সব ছেলের কথা, যাদের বাপ-মা ছেলেরা পাশ হ'লেই খুশি। কিন্তু যেসব ছেলের বাপ-মা চান ছেলেরা ফার্ষ্ট হোক, এরা সেই প্রাইজ পাক—যে প্রাইজ তাঁরা

বন্ধুবান্ধবদের দেখিয়ে বাপেদের মধ্যে ফার্ষ্ট হওয়ার গৌরব অনুভব করবেন—তাদের দুর্ভোগ আরও শোচনীয়। তাদের হয় কম বয়সে পাশ করে বাবার আত্মশ্লাঘার খোরাক যোগানোর জন্য সাধ্যের অতীত উঁচু ক্লাসে ভর্তি হয়ে নাকানি-চোবানি খেতে হয়, না হয় ফার্ষ্ট না হ'তে পারলে, পরের বছর ফার্ষ্ট হবার জন্য (পাকা হয়ে ওঠার জন্য) প্রমোশন না পাওয়ার অপমান সহ্য করতে হয়। বেশীর ভাগই পাকতে পারে না, ক্রমশঃ কাঁচিয়ে যায়। যারাও বা পাকে, তারা প্রায়ই পাকা গুণ্ডা পরিণত হয়।

সুতরাং আমরা যদি সত্যই ছেলেদের মানুষ করে তুলতে চাই তবে শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। অন্ততঃ পক্ষে এই সব বিষয়ে লক্ষ্য করা দরকার যে পড়াটা শিশুর কাছে যাতে সরল ও গ্রহণীয় হয়। তার ক্ষমতা কতখানি এবং কি বিষয়ে তার আগ্রহ বেশী ইত্যাদি।

শিশুর জীবনে বাবা-মা

শিশুর জীবনে বাবা-মা যে কতখানি অবিচ্ছেদ্য অংশ তা আমাদের বাপ-মারা সাধারণত উপলব্ধি করতে পারেন না। বাবা ও মার কাছ থেকে শিশুকে তার জীবন গড়ে তোলার দু'টি অপরিহার্য উপাদান পেতে হয়? দু'টি দু'রককের ব্যক্তিত্ব শিশুর ব্যক্তিত্বকে পুষ্ট করে। দুই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দুই রকমের ভালবাসা মেশান থাকে। মা শিশুর কাছে একেবারে আপন—তার সঙ্গে সে নিজেকে এক করে দেখে। মার কাছে শিশু সম্পূর্ণ স্বাধীন—তার সমস্ত অক্ষমতার গৌরব তাঁর কাছে, সমস্ত দুঃখের অবসান তাঁর কাছে, সমস্ত অপরাধের ক্ষমা তাঁর কাছে। মার ভালবাসাই শিশুর মনকে রস যোগায়।

বাপের ভালবাসা কিন্তু অন্য ধরনের। শিশু তার অক্ষমতা তাঁর কাছে প্রকাশ করতে লজ্জা পায়, তার দুঃখ সেখানে প্রশ্রয় পায়

না, তার অপরাধের সেখানে বিচার হয়। বাপ যেন শিশু থেকে একটু দূরে। গাছের কাছে মাটি যেমন—তাকে রস যোগায় ও আঁকড়ে ধরে থাকে—শিশুর কাছে মাও তেমনি। আর গাছের কাছে আকাশ যেমন বহুদূর নীলিমার নির্দেশ দেয়, বৃষ্টি ও বজ্রও আসে সেখান থেকে, শিশুর কাছে বাপও তেমনি একটি বৃহৎ ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ—তাকে রক্ষা করেন ও শাসন করেন।

কিন্তু মা যদি একেবারেই 'মা' হন, তবে বিপদ হয়—প্রশ্রয় পেয়ে ছেলে একেবারে উচ্ছন্নে যেতে পারে। আর বাবা যদি একেবারেই 'উরেব্ বাবা' হন, তবে সে ছেলের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। মাকেও শিশুকে কখনও কখনও কড়া শাসন করতে হয় এবং অনেক সময় বাবাকেও শিশুকে ভালবাসা দিয়ে শাসন করতে হয়। এই দুই ভালবাসার যদি ব্যতিক্রম ঘটে এবং সমতা না থাকে, তবে শিশুর মনে কতকগুলো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে শেষে অপরাধ প্রবণতা দেখা দিতে পারে। বাবা বা মা-হারা ছেলেদের মধ্যে সেই কারণে অপরাধপ্রবণতা একটু বেশী করেই দেখা যায়। অনেক ছেলের বাপ-মা, চাকর ও ঝিয়ের হাতে তাঁদের শিশুর পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব দিয়ে দায়িত্ব মুক্ত বোধ ক'রে আনন্দ উপভোগ করেন। তাতে যা ফল হবার তাই হয়। ফলে শিশু অনেকক্ষেত্রে তার জন্মদাতা পিতামাতার গুণ না পেয়ে, পালক-পিতামাতা (চাকর ও ঝির) গুণ পেয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এভাবেও অপরাধপ্রবণতা শিশুর মধ্যে সংক্রামিত হয়।

শিশু-অপরাধ ও গৃহ-পরিবেশ

শিশুর জীবনে বাবা-মার কথা বলতে গেলেই তার বাড়ীর পরিবেশের কথা আপনি এসে পড়ে। শিশু অপরাধ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁরা বলে থাকেন যে, স্বাভাবিক গৃহ-পরিবেশের চেয়ে অস্বাভাবিক গৃহ-পরিবেশের মধ্যেই শিশু অপরাধী হবার

সম্ভাবনা থাকে খুব বেশী। পরীক্ষামূলকভাবে ১০০০টি শিশু অপরাধীর মধ্যে দেখা গেছে যে, প্রায় ৫০০টি এমন সব বাড়ী থেকে এসেছে, যেখানে হয় তাদের বাবা-মা মৃত বা তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে বা বনিবনা নেই বা শিশু অনেকদিন ধরে তাঁদের ছেড়ে আছে। শিশুর মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি না দেওয়া, স্নেহ-যত্ন থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা, খেলাধুলায় যথেষ্ট সুযোগ না দেওয়া, পরিবারের আদর্শ-হীনতা ইত্যাদি পরিবেশও শিশুর অপরাধের পথ সহজে নিয়ে যায়।

আবার তুলনামূলকভাবে দেখা গেছে যে, অপরাধপ্রবণ শিশুদের অভিভাবকদের মধ্যেই পানাসক্তির প্রাবল্য বর্তমান। এই পানাসক্তিকে অন্য কারণ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে যদিও ভুল করা হবে, তবুও আমাদের এটা জানা দরকার যে পানাসক্তির প্রতিক্রিয়া শিশুর ওপর নানান ভাবে দেখা দিয়ে তার শারীরিক, মানসিক দুই রকমের ক্ষতিই করতে পারে। তা' ছাড়া গৃহের দূষিত পরিবেশেই শিশুর নৈতিক দৃঢ়তার ভিত্ শিথিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশী। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, যে-শিশুর নিজের বাবা-মার ওপর শ্রদ্ধা নেই তার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা রাখাও কঠিন। আর সেই ভাব ক্রমে সাধারণ ন্যায়-নীতির ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়া কিছু আশ্চর্য নয়।

সুস্থ ও সম্পূর্ণ গৃহ পরিবেশের মধ্যে ভাইবোনের অভাবের কথাও একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রায়ই দেখা যায় শিশু অপরাধীরা সাধারণতঃ বাড়ীর একমাত্র সন্তান হয়ে থাকে। হয় তাঁদের ভাইবোন থাকে না বা তাদের সঙ্গে বয়সের বেশ তফাৎ থাকে। অসম্পূর্ণ পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে ভাইবোন শূন্য একমাত্র শিশুর অবস্থা যেমন দুঃখের তেমন কষ্টেরও বটে। বাপ মার স্নেহপরায়ণ দয়ালু, বিবেচক, সঙ্গতিপন্ন সবকিছুই হতে পারেন কিন্তু বাড়ীতে যদি অন্য শিশু না থাকে, তা হ'লে শিশুর পক্ষে গৃহ-পরিবেশ ত্রুটিহীন বলা যেতে পারে না। কারণ,

এই রকম পরিবেশে শিশু সমবয়সী সঙ্গীসাথীদের আনন্দলাভ থেকে বঞ্চিত থাকে, তার সামাজিক বোধ যথাযথ জাগ্রত হয় না, প্রতিযোগিতার উৎসাহ দেখা দেয় না, দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে দিয়ে শৃঙ্খলা বোধ জাগেনা, মেলামেশার মধ্যে দিয়ে যে-অদৃশ্য ও ধীর শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকে, তার থেকে শিশু বঞ্চিত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে যদি বাবা বা মার অভাব বর্তমান থাকে, তবে সাধারণতঃ সঙ্গীহীন শিশুর মনের গঠন সুস্থ ও স্বাভাবিক হওয়া কঠিন হয়ে ওঠে এবং তার কাছে অপরাধের পথও পিছল হয়ে পড়ে। এই সহজ ও পিছল পথেই সে জীবনের একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি খোঁজে।

পারিবারিক চক্র সম্পূর্ণ থাকলেই যে গৃহ-পরিবেশ শিশুর পক্ষে অনুকূল হবে এমন কথা নেই। হয়তো দেখা যাবে যে, বাবা-মা ভাইবোন ইত্যাদি সবকিছু বর্তমান কিন্তু বাড়ীতে সামঞ্জস্যপূর্ণ শাসন শৃঙ্খলার অভাব। কোথাও বা শাসনের চূড়ান্ত কোথাও বা শাসন একেবারেই নেই ; আবার কখনও একই সময় কড়া, আল্গা দুইরকম শাসনই চলছে। কোথাও বাবা খুব কড়া, মা একদম নরম, কোথাও আবার ঠিক উল্টো। অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে আবার অভিভাবকরা শৃঙ্খলা জ্ঞান দেওয়া দরকার বলেই মনে করেন না। শাসন-শৃঙ্খলার প্রতিক্রিয়া শিশুর নৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরই রকম-ফেরের জন্য হয়তো সে বাবা-মাকে প্রকাশ্যেই অগ্রাহ্য করে, বিদ্রোহ ঘোষণা করে, পালিয়ে যায়, চুরি করে মিথ্যা কথা বলে বা এমন সব অদ্ভুত আচরণ করে যার কারণ খুজে পাওয়াই দুষ্কর। সাজা ও শৃঙ্খলার কথা আমরা পরে আলাদা ভাবে বলবো, তবে এইটুকু অভিভাবকদের জানা দরকার যে, দৃঢ় ও সহৃদয় যুক্ত শাসন-শৃঙ্খলা সকলের চেয়ে উপযোগী।

অভিভাবক, গৃহ-পরিবেশ ও কর্তব্য

গৃহ পরিবেশের সঙ্গে শিশুর অপরাধ প্রবণতা যে কতখানি

অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এর থেকে আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি। কাজেই সুস্থ গৃহ-পরিবেশ বলতে কি বোঝায় সেটা অভিভাবকমাত্রেরই জানা প্রয়োজন।

শৈশবে গৃহ শিশুকে যে শুধু আশ্রয় দেবে আর পালন পোষণ করবে তা নয়, সেখানে এ শিক্ষাও তার পাওয়া দরকার যে, কেমন ক'রে সমাজ সম্মত আচার ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয় এবং রাগ, ভয় ভালবাসা ইত্যাদি বৃহত্তর প্রবৃত্তির ডাকে কেমনভাবে যথাযথ সাড়া দিতে হয়। উপযুক্ত গৃহ পরিবেশ শিশুর কাছে বৃহত্তর সমাজেরই ক্ষুদ্ররূপ। সমাজে সকলের সাথে মিলেমিশে কেমন ক'রে থাকতে হয় তারই হাতে খড়ি চলে এখানে। বাইরের সঙ্গে এর তফাৎ এই যে, শিশুর সঙ্গে ঘরের সম্বন্ধগুলি সারল্যের, স্নেহের ও আদরের ; তাই শিশুর ওপর বাড়ীর কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তাকে এই স্নেহময়-পরনির্ভরতা থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি দান ক'রে বৃহত্তর ও কঠিনতর সমাজ ও জীবন সংগ্রামের উপযোগী ক'রে তোলা।

সুতরাং দায়িত্বটা খুব সোজা নয়। একতাল কাদা শিল্পক্ষমতা বর্জিতের স্থূল হাতে পড়লে (কাদার প্রাণান্ত হ'য়েও) কিম্ভুত কিমাকার পদার্থ তৈরী হ'তে পারে মাত্র ; আবার সেই কাদাই সুনিপুন শিল্পীর হাতে পড়লে হয়ে ওঠে এক অতি সুন্দর শিল্প। শিশুর ব্যক্তিত্বও প্রায় তেমনি একতাল কাদার মত—উপযুক্ত অভিভাবক ও শিক্ষকের হাতে পড়লে সমাজের কল্যাণকর মানুষ সে হ'য়ে উঠতে পারে। তাই আমরা পূর্বেই বলেছি, কিম্ভুত-কিমাকার পদার্থের জন্য যেমন কাদাকে দোষ দেওয়া যায় না, তেমনি অপরাধ প্রবণতার জন্য শিশুকে দোষ দেওয়া যায়না—অভিভাবকই তাকে অপরাধী করে তোলেন।

এই প্রসঙ্গে আলোচিত একটি বিদেশী মহিলার কথায় বলি, অপরাধ প্রবণতাকে দূরে রাখতে হ'লে একটি সুস্থপরিবারে বাবা-ই হবেন অপেক্ষাকৃত কর্তৃত্বপরায়ণ, কিন্তু তাই বলে হৃদয়হীন বা নীচমনা

নন! পারিবারিক ব্যক্তিগত বা সামাজিক কাজে থাকবে তাঁর উৎসাহ আর অগ্রগামিতা। স্ত্রীর প্রতি তাঁর থাকা প্রয়োজন কর্তব্যবোধ নয়—ভালবাসা আর সন্তানদের জন্য প্রকৃত কল্যাণাকাঙ্ক্ষা। মায়ের মনেও চাই সন্তোষ। জীবনের চরম সুখ যেন তাঁর স্বামী-পুত্রকে অতিক্রম করে বহির্মুখী না হয়ে ওঠে। তাঁর পক্ষে সামাজিক ক্রিয়া কর্মে এগিয়ে যাবার অর্থই হবে মাতৃহৃদয়কে আর একটু প্রসারিত করে দেওয়া।

এ ছাড়াও তাঁদের ছেলেমেয়েদের ওপর নজর রাখতে হবে ব্যক্তিগতভাবে আগে সতর্ক হ'তে হবে, বড় ছেলে, ছোট ছেলে, একমাত্র ছেলে এবং রুগ্ন ছেলেদের সম্পর্কে—যাতে তাদের অন্যায় আব্দার সহ্য করে ও অত্যধিক আদর ও আহ্লাদ দিয়ে নষ্ট না করা হয়—কারণ এই সব ছেলের মধ্যেই অপরাধপ্রবণতা বেশী দেখা গেছে।

তারপরে খেয়াল করতে হবে, শিশুর স্নায়বিক দুর্বলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা? অকারণ ভয় ও উৎকণ্ঠা তার আছে কিনা, কথায় কথায় অদ্ভুত জিদ্ ক'রে বসে কিনা, রাগের মাথায় জিনিষপত্র নষ্ট করে বা ভেঙ্গে ফেলে কিনা, মেজাজটা খিট্‌খিটে কিনা, যা' কিছু বলা যাবে তাই অমান্য করার সে চেষ্টা করে কিনা, মিথ্যা কথা বলার একটা প্রবণতা আছে কিনা। না বলে অপরের জিনিষ নিয়ে আসার মনোভাব আছে কিনা এবং অন্যকে ঠকিয়ে আমোদ পায় কিনা। এই সব লক্ষণ দেখা মাত্র সাবধান হ'তে হবে ও বুঝতে হবে যে এতে শিশুর মনের সহজাত ও স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি উৎকর্ষের দিকে না গিয়ে অবনতির দিকে যাচ্ছে। এই অবস্থায় তার প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিশুরা বড়ই অনুকরণ করতে ভালবাসে। সেইজন্য যে পারিপার্শ্বিক থেকে সে ঐ সকল দোষ অনুকরণ করে নিয়েছে, তার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে স্নেহপ্রবণ শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের কাছে তাকে দিতে হবে। ভালবাসার

শাসনে তার ওপর নৈতিক ও সামাজিক চাপ আনতে হবে। খেলাধূলা ছবি আঁকা এবং গঠনমূলক নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদে তাকে আকৃষ্ট ক'রে তার মধ্যে তাকে ব্যাপৃত রাখতে হবে।

শিশুমনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তার অপরাধসূচক প্রকাশ

শিশুমনের বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের জগতের সাথে তার বিরোধ বাধে। পদে পদে বাধা পেয়ে সে যখন বাহিরের জগতের নির্মম নিয়ম কানুনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন কল্পনায় সে সব বাধা ডিঙিয়ে অবলীলাক্রমে অসম্ভব সাধন ক'রে সকলের উপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র রাজপুত্রের মত পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে পাহাড় পর্বত নদীনালা ডিঙিয়ে সে কল্পনার রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে ছোটে। সে খুঁজতে থাকে আলাদিনের প্রদীপ, যার সাহায্যে সে এই নির্মম ও কঠোর জগতকে বশে আনতে পারবে। রবীন্দ্রনাথের "বীরপুরুষের" মত মাকে ডাকাতদলের হাত থেকে রক্ষা করে সে দাদার উপরে এক হাত দেখে নিতে চায়। এতে তার কল্পনাশক্তি বাড়ে বটে কিন্তু "গল্পসল্পের" সতুর মত সে যদি বাইরে ক্রমাগতই পরাজিত ও লাঞ্ছিত হ'তে থাকে তবে চিরকালই তাকে ঘরে দরজা বন্ধ করে ওয়াটর্লু বিজয় করতে হয়।

বাপ-মা যদি তার জীবনে সমন্বয় না দিতে পারেন, তবে সে কিছুতেই স্বস্তি পায় না—ফলে তার মনে দ্বন্দ্বের আবর্ত সৃষ্টি হয়ে তাকে তলিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। নিজেকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও সে অনেক সময় পেরে ওঠে না। বাপ-মার ভালবাসা সে তখন গ্রহণ করতে পারে না; সব ব্যাপারেই তার সন্দেহ জাগে। ভালবাসাকে সে শাসন মনে ক'রে তার প্রতি বিমুখ হয়। ভাল কথা বললেও, সে মনে করে ফাঁকি দিয়ে এমন কিছু তাকে দিয়ে করিয়ে নেবার চেষ্টা হ'চ্ছে যা তার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। এ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে নানারকম ফন্দী আঁটে, বেমালুম মিথ্যা কথা বলতে একটুও দ্বিধা করে না—এমন কি জয়লাভের গৌরব

অনুভব করে। আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, সত্য মিথ্যা এবং ন্যায় অন্যায়ের ধারণা শিশুর মনে টন্‌টনে থাকে। আমরা তাকে ভুলোবার জন্য মিথ্যা কথা বা ছলকৌশলের আশ্রয় নিলে বা তাকে ঠিকমত বোঝাবার চেষ্টা না করে তার প্রতি অন্যায় আচরণ করলে বা সামান্য দোষে কঠোর দণ্ড দিলে, তা' শিশুর কাছে ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুবই থাকে। আমরা এটা খেয়াল করি না যে, শিশুর কাছে এ যদি ধরা পড়ে যায়, তাহলে তার মনে এ সব একটা স্থায়ী দাগ রেখে যায়। আমরা বুঝি না বা বুঝতে চেষ্টাও করি না যে, ঐ শিশু কোন না কোন উপায়ে এর প্রতিশোধ নেবেই। প্রতিশোধ আসে যে রূপ নিয়ে তা দেখে আমরা প্রায়ই আঁতকে উঠি এবং তার পুর্বজন্মের বা তার সঙ্গীদের ওপর দোষ চাপিয়ে অথবা নিজেদের অদৃষ্টে করাঘাত হেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। না হয়, দুর্বলের ওপর নির্মমভাবে নিজের প্রবলতা দেখিয়ে আত্মশ্লাঘা অনুভব করে থাকি।

পুত্রকন্যাদের মধ্যে স্নেহবণ্টন ব্যাপারে বাপ মা সামান্য পক্ষপাতিত্ব দেখালে শিশুদের কাছে তা ধরা পড়ে এবং তার থেকে ভাই-বোনেদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা দেখা দেয় ও পরস্পরকে জব্দ করার চেষ্টা চলে। ঈর্ষার বস্তু ভাই বা বোন তার কৌশলের ফলে নিহত হ'লে বা শাস্তি পেলে সে গভীর আনন্দ অনুভব করে। এই বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য ক্রমশঃ সে অনেক সময় যে কোন অপরাধ করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

পড়ার কোন বিষয়ে স্বাদ না পেলে, বা পড়া তৈরী না হলে বা কোন মাষ্টারের কড়া ব্যবহারের আশঙ্কা থাকলে শিশু ইস্কুলে যেতে চায় না। বাপ-মার কাছে সে কথা সোজাসুজি বললে যখন লাভ হয় না, তখন সে নানারকম মিথ্যা ছুতো দেখিয়ে রেহাই পেতে চায়। তাতেও কাজ না হলে ইস্কুল যাবার নাম ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে অধঃপতনের দিকে যেতে পারে।

ব্যর্থতা—অন্তর্দ্বন্দ্ব—অলীক কল্পনা

বহির্জগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করতে গিয়ে বিফল হলে বা কোন কিছু একান্ত করে পাবার ইচ্ছা করে তা না পেলে বা ব্যক্তিত্বের কোন গলদের দরুন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পেরে শিশুর মনে ব্যর্থতা জনিত হতাশা দেখা দেয়। এই হতাশা থেকে সুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। অনভিজ্ঞ শিশু বাইরে পড়ে পড়ে আঘাত খেয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে তার মনের মধ্যে ঝড় চলতে থাকে। যাকে পাওয়া গেল না তার প্রতি তৃষ্ণা ও বিতৃষ্ণা উভয়ই সৃষ্টি হয়ে মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। বাস্তব জগতে তাকে না পেলেও, মনে মনে তাকে পাবার জন্য সে চেষ্টা করে এবং অলীক কল্পনায় গা ভাসিয়ে দেয়। এই অলীক কল্পনা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন; না পাওয়াকে পাইয়ে দিয়ে মনকে শান্ত করা এবং সেই সঙ্গে বহুদিন ধরে মনের সঞ্চিত আবর্জনা পরিষ্কার করা যায় মনের এই কল্পনা শক্তির সাহায্যে। এই কল্পনাশক্তি যার বিকাশ হয় নাই, তার পক্ষে মনের দ্বন্দ্ব থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু অলীক কল্পনার আতিশয্য দেখা দিলে বাস্তববিমুখতা দেখা যায় এবং মনের শৈশবাবস্থা কাটতে চায় না।

শাস্তি ও শিক্ষা

শিশুকে শাস্তি দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি প্রচীনকাল থেকেই চলে আসছে এবং কথাটাও শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, শিক্ষার সঙ্গে শাস্তি যুক্ত না থাকলে শিক্ষাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পাঠশালার পণ্ডিতরা কারণে অকারণে ছাত্রদের মারধোর করাটা ধারাপাত মুখস্থ হওয়ার পক্ষে অপরিহার্য উত্তেজক বলে মনে করতেন। তাড়না করলে শৃঙ্খলা বোধ বাড়ে ও নৈতিক উন্নতি হয় বলে কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে মনে করা হ'ত।

কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, বেতের ব্যবহার

যত কম করা যাবে ততই শিশু সহজ ও সুস্থ মন নিয়ে বড় হ'য়ে উঠতে পারবে।

বস্তুতঃ অন্যকে নিগ্রহ করে আত্মতৃপ্তি লাভের যে সহজাত প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে আছে, তারই চরিতার্থ করার জন্য বেশীর ভাগ সময়েই আমরা শিক্ষা দেওয়ার নাম ক'রে শিশুকে মারধোর করি, কারণ সব অন্যায় ও নির্মম কাজ একটা মহৎ নামের আড়ালে করাকেই সভ্যতা বলে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, কুকুরকেও মারার আগে তাকে একটা অপবাদ দিও। আমরাও শিশুকে দিয়ে একটা অপরাধ করিয়ে তাকে মেরে আরাম পাই।

আবার অন্যদিকে নিগৃহীত হওয়ার একটা সহজাত প্রবৃত্তিও বহু শিশুর মধ্যে থাকে। তাই অপরাধ করে সে নিগ্রহ লাভের পথ করে নেয়। এই কারণে দেখা গেছে যে মার দিয়ে কম শিশুকেই শোধরানো গেছে। অপর পক্ষে মার খাওয়া শিশুর অপরাধ স্পৃহা যে বেড়েই গেছে, তারও ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।

শিশু কোন একটি অপরাধ করলে, তার মূল কারণটি আগে জেনে নিতে হবে—তার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা ক'রে, তার পারিপার্শ্বিক বিচার ক'রে এবং ঐ অপরাধমূলক কার্যের প্রেরণার উৎসের সন্ধান ক'রে। তারপরে স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে শিশুকে আগে নিজের বশে আনতে হবে এবং মূল কারণটির মধ্যে যেটা অন্যায় ও লজ্জাজনক আছে সেটা শিশুর কাছে তুলে ধরতে হবে। অর্থাৎ শিশুর যুক্তিবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়ে তার অন্তরকে টেনে এনে ঐ অপরাধের বিচার তাকে নিজেকেই করতে দিতে হবে। দেখা যাবে, শিশু ন্যায্য বিচারই করেছে এবং নিজের মনে লজ্জা পেয়েছে। এই চেষ্টা বারবার করেও যদি ফল না হয় তাহ'লে বাড়ীতে তাকে সব ব্যাপার থেকে বাদ দিয়ে সামাজিকভাবে সে যে বর্জনীয় এই কথা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এই সময় কিন্তু তার প্রতি আরও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হ'বে। এই চেষ্টাতেও যদি শিশু না শোধরায়, তখন

দৈহিক শাস্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হ'বে যে, শিশুকে কখনও শান্ত ও স্থির মেজাজে মারধোর করা উচিত নয়। নিজে না রেগে শিশুকে মারা ঠিক নয়। শিশুকে মার দিয়ে কিছু পরে ভালবেসে তাকে আবার কাছে টেনে নিতে হবে এবং স্নেহ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সে ঐ অপরাধ করায় তার ভালর জন্যই তাকে মারা হয়েছে। এরপরে তাকে একটু বেশী করে খাতির করতে হবে এবং সম্ভব হ'লে বেশী সময় নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখতে হবে।

শিশু অপরাধের ধরন ও প্রতিকারের ইঙ্গিত

সাধারণতঃ ছয় রকমের শিশু-অপরাধ দেখতে পাওয়া যায়।

(১) সহজ ধরনের অপরাধ প্রবণতা

এই অপরাধ শিশুদের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায়। স্বাভাবিক শিশুরাও অনেক সময় এই ধরনের অপরাধ ক'রে থাকে। মানসিক অস্বাভাবিকতা এদের বিশেষ কিছু থাকে না। বাড়ীতে না থাকা, পড়াশুনায় মনোযোগ না থাকা, শৃঙ্খলা অমান্য করা, মিথ্যাকথা বলা, ছোটখাট চুরি করা, শাসন করলে বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠা—এই সব হ'চ্ছে এর লক্ষণ। এদের কড়া শাসন ক'রে লাভ নেই, ভালবাসার শাসনে এরা বাধ্য ও বশ হয়। সামাজিক অবহেলায় বা বেশী আদরে এদের আগ্রহ এত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে যে, নানা রকম সমাজ-বিরোধী কাজ ক'রে এরা বিদ্রোহ প্রকাশ করে এবং আত্মগৌরব অনুভব করে। কোন স্বাভাবিক ও সুস্থ শিশুসুলভ আগ্রহে তাদের মনকে বেঁধে রাখা যায় না। যেমন ধরুন এই উদাহরণটি :

মা-বাবার একমাত্র ছেলে। বয়স যখন নয় বছর, তখন থেকেই মিথ্যা কথা বলতে সুরু করে। অল্পদিন পরেই দেখা গেল, সে চুরি করা শিখছে। ঘরের জিনিষ একে একে উধাও হওয়া শুরু হ'ল। মনে এই গোলমাল ঢোকার আগে পড়াশুনায় সে বেশ ভালই ছিল।

কিন্তু পরীক্ষায় ফল তার খারাপ হ'য়েছে দেখে অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল, বাড়ী থেকে ইস্কুলে যাওয়ার নাম ক'রে, সে ইস্কুলে না গিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতো। কোন দিন ইস্কুলে গেলেও, ইস্কুল থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই পালাতো।

বাবা তার কড়া ধরনের লোক ছিলেন। তাই কড়া শাসনের তিনি ব্যবস্থা করলেন এবং কড়া দেখে একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। ফল হ'ল আরও খারাপ। ছেলে একেবারে ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলে। উপায় না দেখে তিনি ছেলেকে কোন এক শিশু-শোধনালয়ে দেবেন বলে ঠিক করলেন এবং একজন মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ নিলেন। ছেলেটির বুদ্ধি পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, তা' সাধারণ শিশুর চেয়ে অনেক বেশী। মনোবিজ্ঞানী তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন, আহ্লাদ দেওয়া ও আব্দার মেটানো বন্ধ করে ভালবাসার শাসনে তাকে রাখা এবং ছবি আঁকা ও তার দেহমন গঠনের সহায়ক যে কোন বিষয়ের দিকে তার আগ্রহ কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করা দরকার।

পরামর্শ অনুসারে ছেলেকে তার মামার বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল যখন। তার বয়স এগারো; মামাদের বিশেষ সতর্ক ভালবাসার শাসনে তাকে রাখা হ'ল। ছবি আঁকার রং তুলি তাকে কিনে দেওয়া হ'ল। তাই দিয়ে সে যা-খুশী-তাই করে যেতে লাগলো। বিক্ষিপ্ত মনে কিছুটা ধরা দেবার ভাব দেখা গেল। কিন্তু নিশ্চিত উন্নতি হ'য়েছে কিনা বোঝা গেল না। সেই সময় তার বাবা কিনলেন একটা চড়বার ঘোড়া। বাবা ঘোড়া কিনেছে শুনে, ছেলের আর মামার বাড়ী ভাল লাগে না। তার সখ সেই ঘোড়া চড়ে বেড়াবে। জিদ্ ধরলো বাড়ী যাবে বলে। বাড়ীতে আনা হ'লে, ঘোড়া দেখে সে খুব খুশী। চড়ল তাতে। শেষে এমন হ'ল যে, সকালে বিকেলে ঘোড়ায় চড়া, ঘোড়াকে খাওয়ানো, দেখাশুনা করা ইত্যাদিতে তার এত মন লেগে গেল যে, কোথায় গেল তার অপরাধ করার স্পৃহা! দুর্দান্ত

ধরনের ছেলেদের ঘোড়া দিয়ে ঠাণ্ডা করা সহজ। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী উইনষ্টন চার্চ্চিল তাঁর আত্মজীবনীতে বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁর ছোট বেলায় তাঁর বাবার তেজীয়ান ঘোড়া তাঁকে কতখানি গড়েছে। তিনি অবস্থাপন্ন পিতাদের পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁদের ছেলেদের যেন তাঁরা একটা বেগবান ঘোড়া উপহার দেন। অতে তারা চার্চ্চিল হ'তে অবশ্য নাও পারতে পারে, কিন্তু ছিঁচ্‌কে চোর যে হ'বে না তা নিশ্চিত বলা যায়।

(২) স্বাভাবগত অপরাধ প্রবণতা। দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গেও বিশেষ ধরনের অপরাধ স্পৃহা জাগতে পারে। বয়ঃসন্ধিক্ষণ যে জীবনের বিপজ্জনক সময় তা' কম বেশী সকলেই উপলব্ধি করেছেন। ছেলে মেয়ে উভয়েরই মধ্যে এই সময় যৌন-অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয়। চুরি করার স্পৃহাও কখনও কখনও দেখা যায়। এই সময়কার অপরাধীদের মনোবিজ্ঞানীকে দিয়ে চিকিৎসা না করলে পরে অসাধ্য হ'য়ে উঠতে পারে। যেমন একটি মেয়ের উদাহরণ দেওয়া যাক:

ছোটবেলা থেকেই তার বিছানায় প্রস্রাব করা অভ্যাস ছিল। যখন তার বয়স চার, তখন তার মা মারা যান। ভাই বোনে ওরা পাঁচজন এবং ওই সবার ছোট। মা মারা যাবার (দু'বছর) পর বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। সৎমাকে সে মোটেই ভালবাসে না এবং সৎমাও তার বিছানায় প্রস্রাব করা নিয়ে তাকে খুব গালাগালি দিতেন; তা' নিয়ে বাড়ীতে অশান্তি লেগেই থাকত। বিয়ের চার বছর যেতে না যেতে বাবা ও মার মধ্যে সামান্য কারণে ঝগড়া হ'তে আরম্ভ হয়। এই সুযোগ নিয়ে মেয়েটি তার সৎমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার সব কৌশল অবলম্বন করে। বাবা অফিস থেকে ফিরলে সে সৎমার নামে মিথ্যা করে লাগাত।

কয়েক বছর পরে বাবা মারা যান এবং সে যারপরনাই মনোকষ্ট পায়। চৌদ্দ বছর বয়স হ'লে মেয়েটির প্রথম নারীধর্ম দেখা

দেয়। তারপরেই সে একদিন শ্মশান ঘাটে গিয়ে কাঁদতে থাকে। পরদিন সে তার সৎমার সোনার গহনা চুরি করে মাটিতে পুঁতে রাখে। কয়েকদিন পরে সে নিজেই সোনার গহনা বের করে আনে এবং বলে যে, মজা দেখার জন্য সে এরকম করেছিল।

তারপর কিছুদিন সে স্বাভাবিকভাবেই চলে। কিন্তু আবার মাসিকের সময় তার পূর্ব্বের মত অস্বাভাবিকতার লক্ষণ দেখা দেয়। একদিন সে পাশের বাড়ীর একটা চালা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই রকম কয়েকটি ঘটনার পর তাকে একজন মনোবিজ্ঞানীর কাছে আনা হয়। মনোবিজ্ঞানী তার মনোসমীক্ষণ করে 'হর্মন্‌স্‌ চিকিৎসা করেন। দীর্ঘকাল তাঁর চিকিৎসাধীনে থাকার পর সে একেবারে স্বাভাবিক হয়ে যায়। এখন বিয়ে করে ঘরসংসার করছে।

(৩) **সরল অপরাধ প্রবণতা** : শিশুরা অনেক সময় চুরি বা অন্য প্রকারের অপরাধ করে। এদের প্রথমে পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন করে দেখতে হয়, কতখানি কাজ হ'ল। বিশেষ ফল না পেলে কিছু শাসন বা শাস্তি দেওয়া দরকার। এই ধরনের ছেলেদের শাস্তিতে কাজ হয়। এই কথা কয়টি পড়ে, যারা শাস্তি দিয়ে, বিশেষ করে শিশুকে শাস্তি দিয়ে বেশ আরাম পান, তাঁরা খুশী হ'য়ে উঠতে পারেন এই ভেবে যে, এরকম একটি ছেলে হাতে পেলে তাঁরা হাতের আশ মিটিয়ে নেবেন। তাই ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি করে বলে রাখি, শাস্তি দেওয়ার সময় মনে রাখা উচিৎ, শিশুর পিঠ চামড়া দিয়ে গড়া এবং সে চামড়াকে গণ্ডারের চামড়ায় পরিণত করলে তার স্বভাবটাও চামড়া অনুযায়ী হ'য়ে যেতে পারে।

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে শিশুর মনে এই ধরনের বিকার দেখা দেয়। অর্থনৈতিক কারণ এর জন্য অনেকটা দায়ী থাকলেও সবটা দায়ী নয়। না হলে, গরীব লোকের ছেলে মাত্রই এই অপরাধ করত। অথচ এই রকম অপরাধ প্রবণত বড় লোকের ছেলেদের মধ্যেও অনেক দেখা যায়।

ভবে সামাজিক কারণ অবশ্য এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। আদর আহ্লাদ একেবারে না দিলে বা খুব বেশী দেওয়ার ফলে সাধারণত এই দোষ দেখা যায়। (দ্বিতীয়টার জন্যই বেশী)। এদের নিয়ে কাজ করা একটু কঠিন। এদের সবতাতে স্বাধীনতা দিতে হবে, সখ মেটাবার জন্য হাতে কিছু পয়সা দিতে হ'বে, ঠেকে শিখতে দিতে হবে এবং সঙ্গে উপদেশও দিতে হবে। উপদেশ এরা শোনে বলে তাতে কাজের সাহায্য হয়।

এই ধরুন এক গাঁয়ের ছেলে। বাপ-মার অবস্থা বেশ ভাল। দশ ভাই বোনের মধ্যে সে সবচাইতে ছোট। তার তিন বছর বয়সের সময় তার বাবা মারা যান।

সব চাইতে ছোট ছেলে বলে তার আদরের আর পরিসীমা ছিল না। একান্নবর্তী পরিবারের বৃহৎ গোষ্ঠীর সকলেই তাকে আহ্লাদ দিত। তার আট বছর বয়সে সম্পত্তি নিয়ে বাদ বিসম্বাদের মধ্য দিয়ে, বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার টুকরো টুকরো হয়ে পৃথগান্নবর্তী বহু পরিবারে বিভক্ত হ'য়ে পড়ে।

ঠিক এই সময়েই শিশুটিকে দুই একটি জিনিষ চুরি করছে দেখা যায়, কিন্তু তার প্রতিকারের কোন চেষ্টা হয় না। ক্রমে পাড়ার উপর তার অত্যাচার সুরু হয়। শাসন করতে গেলে আরও ক্ষেপে ওঠে।

গাঁয়ের এম, ই ইস্কুলে সে পড়ত। লেখাপড়ায় মন্দ ছিল না। যতই বদ খেয়াল বাড়তে লাগল লেখাপড়ায়ও ততই সে খারাপ হ'তে লাগল। একদিন হেডমাষ্টার মশায় তাকে বকায় সে তার সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে ইস্কুল বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে এল এবং হেডমাষ্টার মশায়কে শাসিয়ে এল যে, তাঁর বাড়ীতেও সে আগুন লাগাবে।

তাকে কলকাতার কাছে তার মামার বাড়ীতে আনা হ'ল। মামারা তাকে মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে গেলেন। মনোবিজ্ঞানীর কথামত, তাকে যাদুঘরে ও চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া হ'ল সঙ্গে

করে। দেখা গেল, সে খুব আনন্দ পেয়েছে। এর পরে তার স্বভাবের কিছুটা উন্নতি দেখা গেল। রং তুলি তাকে কিনে দিলে সে তাই দিয়ে ছবি আঁকতে লাগল এবং মনোবিজ্ঞানীর কাছে এনে দেখাত। তিনি তারিফ করতেন এবং সম্ভবত তিনি তার উঁচুস্তরের শিল্পের একমাত্র সমঝদার ছিলেন। এর পরে আবার ইস্কুলে ভর্তি করে দিলে আগের দুষ্টুমী আর সেরকম তার দেখা গেল না।

মাঝখানে একবার তার কাছে মা আসায় তার পূর্বের আবহাওয়া সৃষ্টি হয় এবং আবার পূর্বের মত ব্যবহার সে সুরু করে। মা চ'লে গেলেই সে আবার অনেকটা ঠিক হয়। মনোবিজ্ঞানীর মত অনুসারে চলার পর, ছয় মাসের মধ্যেই বিশেষ ফল দেখা যায়। সে ছবি এঁকে নিজের ইচ্ছায় তাঁকে দেখাত এবং তাঁর সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই একঘণ্টা গল্প করে আসত। কোন কোন দিন আব্দার করে তাঁর বাড়ীতে স্নানাহার করে বাড়ী ফিরত। এখন তার ব্যবহার বদলে গেছে। দেখলে মনেই হয় না, সে সেরকম ছিল।

(৪) প্রতিক্রিয়ামূলক অপরাধ প্রবণতা : বাবা-মার স্নেহ শিশুরা ঠিকমত না পেলে অথবা অকারণে বা সামান্য কারণে তাদের কড়া শাসন করলে বা অন্য কোন অন্যায় ব্যবহার তাদের ওপর হলে তাদের মনে এই ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়—মন তাঁদের প্রতি বিমুখ হয় এবং ক্রমে বাপ-মার প্রতি আক্রোশ সৃষ্টি হয়। তার প্রতি যেরকম ব্যবহার করা হয়েছে সুদে আসলে সে তা শোধ করে দিতে চায়। বাপ-মার প্রতি দুর্ব্যবহার বা অত্যাচার করে বা অনুরূপ অপরাধ করে সে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে। এদের যত শাসন করতে যাওয়া যাবে ততই তার উল্টো ফল হ'তে থাকে।

শিশুর মনের বাসনাগুলো ক্রমে চাপা পড়ে যেতে থাকে এবং পরে তার আচরণ-বিকৃতি প্রকাশ পায়। অনেক সময় এর জন্য শিশুরা অবৈধ ও অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। মেয়েরা গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করে বা রক্ষিতা হয়ে জীবন কাটায়। এই সব

ক্ষেত্রে শাস্তি দিলে কোন কাজ তো হয়ই না, বরং মারাত্মক ফলই বেশী দেখা যায়।

রাঁচী পাগল-হাসপাতালে বার্কলে হিল নামে এক সাহেব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ভদ্রলোক লোক হিসাবেও খুব ভাল ছিলেন। তাছাড়া সাধারণ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অপেক্ষা তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও গবেষণা-স্পৃহা অনেক বেশী ছিল।

একবার তাঁর কাছে একটা অতি দুষ্টু ছেলেকে আনা হয়। ছেলেটা একেবারে সব শাসনের বার হয়ে গিয়েছিল। বার্কলে হিল ছেলেটাকে দেখলেন। মনে করলেন, বাড়ীতে ঠিকমত বাপ-মার স্নেহ না পেয়ে ওর আচরণে বিকৃতি দেখা দিয়েছে। তাঁর কেমন একটা কৌতূহল হ'ল। ছেলেটাকে তিনি নিজের বাড়ীতে নিজের সঙ্গে রাখলেন। শিশুর সঙ্গে বুড়ো নানা রকম গল্প করতেন— যতক্ষণ পারতেন তাকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। বুড়ো ও শিশুর এই বন্ধুত্ব এবং আলোচনা দেখার মত ছিল। ছেলেকে তিনি ভালবেসে এমন আপন করে নিলেন যে, সে অসঙ্কোচে তার মনের কথা তাঁর কাছে খুলে বলত। ছেলেটার দৌরাত্ম্য একেবারে কমে গেল।

কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল, বার্কলে হিল সাহেবের টেবিলের ওপর রাখা সোনার ঘড়িটি পাওয়া যাচ্ছে না। খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না। সমস্ত ব্যাপার বিবেচনা করে এসম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ রইল না যে, ছেলেটিই ঘড়িটা নিয়েছে। কিন্তু সে যে এসম্বন্ধে কিছু জানে বা জানতে পারে তার হাবভাব, কথাবার্তা ও প্রশ্নের জবাবে তার বিন্দুবিসর্গও টের পাওয়া গেল না।

বার্কলে হিল ছেলেটাকে কিছু বললেন না। আরও বেশী করে আদর করতে লাগলেন। ঘড়ির ব্যাপারটা ভুলেই যাওয়া হ'ল। বার্কলে হিল ছেলেটাকে আরও বেশী করে সঙ্গে ক'রে বেড়াতে লাগলেন এবং মনোসমীক্ষণ পন্থায় তার মন বিশ্লেষণ করার চেষ্টা

করতে লাগলেন। ছেলেটা অসাবধান বশতঃ অনেক কথাই তাঁকে বলে ফেল্‌ল। প্রসঙ্গক্রমে এও বলে ফেললে, ঘড়িটা সেই নিয়েছে এবং খুলে ফেলেছে। কেন খুলে ফেলল, জিজ্ঞাসা ক'রে কিছু পাওয়া গেলনা। ভাঙ্গা ঘড়িটা সে ফেরত দিলো। ঘড়ি চুরি করে বিক্রি না করে সে তা ভাঙল কেন, তা' জানার জন্য, বার্কলে হিল সাহেব ভাবতে লাগলেন। ঘড়ির যন্ত্রপাতির রহস্য জানবার জন্য নিশ্চয়ই নয়।

বার্কলে হিল চিন্তিত হ'লেন। ছেলেটাকে আরও আপন ক'রে তুলতে লাগলেন এবং মনোসমীক্ষণ পন্থায় জেনে নিলেন ছেলেটা যখন খুব ছোট তখন তার মা অন্তঃসত্বা হন। মার আদরের যে কিছুটা তারতম্য হ'য়েছে তা তার কাছে ধরা পড়ে যায়। মাকে সে কিছুতেই ছাড়তে চাইত না। সে মার পেটের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে থাকত। পেটের মধ্যে ছেলের বুকের ধুক্‌ধুকানী সে কান পেতে শুনত। জিজ্ঞাসা করত, 'তোমার পেটের মধ্যে কি আছে মা?' মা তাড়া লাগাতেন। মনে তার রহস্য বেড়ে চলল। পরে সে দেখল, তার ভাই হয়েছে, এবং ভাই এসে তার আদর অনেকটাই কেড়ে নিয়েছে। ভালবাসা হারানোর রহস্য তার মনে চাপা রইল। ঘড়ির টিক টিক শব্দ শুনলেই সে তাই ঘড়ি খুলে ঐ রহস্য জেনে নিতে চায়।

বার্কলে হিলের চেষ্টায় ছেলেটি সম্পূর্ণরূপে শুধরিয়ে যায়।

(৫) মৃগীরোগজনিত অপরাধ প্রবণতা। মৃগীরোগ থেকেও শিশুদের অপরাধ প্রবণতা দেখা দিতে পারে। উপদেশ বা শাস্তি দিয়ে এদের কোনই ফল হয় না। এদের প্রতি ব্যবহারে বাপ-মা ও অন্যান্য সকলের বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে যেন এদের বেশী ঘাঁটান না হয় এবং উৎসাহও দেওয়া না হয় এবং বাইরেও যেতে না পারে। ডাক্তার-মনোবিজ্ঞানীর কাছে প্রথমে এদের দেখিয়ে ফিট বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। লুমিনাল গার্ডিনাল বা এই জাতীয় ঔষধ

মাত্রামত বহুকাল খাওয়ালে উপকার হয়। মনে রাখতে হবে, এই সব ঔষধ মারাত্মক বিষ। তাই ডাক্তারদের পরামর্শ ছাড়া কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়।

একটি ছেলের কথা জানি। বড়লোকের ছেলে। এর ঠাকুরদাদা পাগল হ'য়ে মারা যান। ছেলেটি ভাই বোনদের মধ্যে সব চাইতে বড়। আর দুইজন ছোট বোন। ছেলেটার বয়স বারো বছর। যখন তার বয়স পাঁচ বছর তখন তার টাইফয়েড হয় এবং তারপর থেকেই ফিট সুরু হয়। টাইফয়েড ও মৃগী রোগে তার বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি একেবারে কমে যায়। এমনকি বারো বছর বয়সেও বর্ণপরিচয় সে শেষ করতে পারে নি। খালি তাই নয়, তার দুষ্টুমিরও অন্ত নেই। ছোট বোনদের কথায় কথায় সে মারে এবং কোন অস্ত্র হাতে পেলেই তা দিয়ে মারতে যায়। দিয়াশলাই পেলে খুব খুশী। একটি একটি করে কাঠিগুলো জ্বালিয়ে শেষ করে। কেউ হাত থেকে নিতে গেলে হয় ছুটে পালায় না হয় জ্বলন্ত কাঠি তাঁর দিকে ছুড়ে দেয়। কখনও কখনও বিছানার চাদরেও সে আগুন লাগিয়ে দেয়। কোন একজন বিখ্যাত ডাক্তার-মনোবিজ্ঞানী তার চিকিৎসা করেন। ফিট অনেক কমে গেছে কিন্তু স্মরণশক্তির কোন উন্নতি হয়নি।

তার আচরণের উন্নতির জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেও কোন ফল হয় নাই। শিক্ষা দিতে গিয়ে বিপদই বেড়েছে। তাকে সঙ্গে করে বাইরে নিয়ে গেলে, বিপদের সীমা থাকে না। দোকান থেকে জিনিষ টান দিয়ে নিয়ে পালায়, ছুটে ট্রামের তলে পড়তে যায়, যেতে যেতে হঠাৎ ফিট হয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। এদের শোধরানোর চেষ্টায় সাধারণতঃ কোন ফল হ'তে দেখা যায়নি।

(৬) স্বল্পবুদ্ধি জনিত অপরাধ প্রবণতা। বোকা ও হাবা গোছের ছেলেরাও নানারকম অপরাধ করে থাকে। ভ্যাব্‌লা গোছের শিশুদের মধ্যে কতকগুলি আছে যাদের কোন না কোন

গ্রন্থির দোষে বুদ্ধির ক্রমবিকাশ হয় না। গ্রন্থি-চিকিৎসা করলে এদের একেবারে স্বাভাবিক বুদ্ধিমান ছেলে হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য খুব শিশু অবস্থায় যে সব শিশুকে ভ্যাব্‌লা বলে মনে হয় তাদের একটুও দেরী না করে ভালো শিশু-চিকিৎসককে দিয়ে তার গ্রন্থি-চিকিৎসা করা নিতান্ত দরকার।

বোকা ছেলেদের মধ্যে যারা মগজের গল্‌তি বশতঃ বোকা-হাবা হয়, তাদের চিকিৎসা করে বুদ্ধিমান করা যায় না—তবে গ্ল টামিক এসিড, গ্রে-পাউডার বা ঐ জাতীয় ঔষধ ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে দীর্ঘকাল খাওয়ালে কিছুটা উন্নতি হ'তে দেখা গেছে।

এই সব ক্ষেত্রে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বংশে এরকম গলদ একটা ছিল। মগজ এদের পরিণত হ'তে না পারায় বুদ্ধির বিকাশ হয় না এবং হিতাহিত জ্ঞান ও সংযমশক্তি একেবারে না থাকায় অপরাধ বলে না জেনে এরা সব রকমের অপরাধ করে বসে। এই অপরাধের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ ও স্পৃহা নাই বলে এদের শোধরানও সম্ভব না। যে সব কাজে বিশেষ বুদ্ধি দরকার হয় না, অভ্যাস হলেই করা যায়, সেই কাজে এদের শিক্ষিত করে তুললে সমাজের কিছু কাজে এরা আসতে পারে।

কেমন করে শিশুকে বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনা যায়

বিপথগামী শিশুদের ফিরিয়ে আনা বড় সহজ কাজ নয়। অত্যন্ত ধৈর্য, সহানুভূতি এবং শিশুমন সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে একাজ করা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, যত দুষ্টুই হোক না কেন ভালবাসায় সে কাবু। আর একটা কথা খেয়াল করতে হবে, সব শিশুই খেলতে খুব ভালবাসে এবং খেলাটা শিশুর দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন—পড়ার চাইতে খেলার দিকে নজর বেশী দিতে হবে। মাঠে ও ঘরে নানারকম খেলা আছে। বিপথগামী ছেলেদের যতক্ষণ পারা যায় ততক্ষণ এই সব খেলার মধ্যে

নিযুক্ত রাখলে অপরাধ স্পৃহা তার কমে যেতে বাধ্য।

আজকাল খেলার মধ্যে দিয়ে পড়ানোর নূতন পন্থা বেরিয়েছে। ধ্বংস করার যে সহজাত প্রবৃত্তি শিশুর মনে থাকে, তার চরিতার্থ হয় খেলার বিমান বা জাহাজ বা রেলগাড়ী ভাঙা ও গড়ার মধ্য দিয়ে। ঐসব খেলনার মধ্যে সত্যকার বিমান, জাহাজ প্রভৃতির প্রধান অংশগুলি থাকে। শিশু ঐগুলি খুলে ফেলে আবার জোড়া লাগায়। ফলে ঐসব যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তার কিছু জ্ঞানও হয় এবং তা শেখবার আগ্রহও জন্মে। ছবির টুকরো সাজিয়ে পুরো ছবি বানানো, রং ও তুলি দিয়ে যা খুশী আঁকা, শব্দতৈরী খেলা, গল্পবলা খেলা, অঙ্কের খেলা প্রভৃতি নানারকমভাবে একসঙ্গে খেলা ও পড়া চলতে পারে। শিশুর একবার তাতে মন লাগলে, সহজে তা সে ছাড়তে চাইবে না। আমরা সবাই চাই, ছেলেটা অন্তত: পক্ষে বি-এ পাশ করুক। ছবি আঁকা, গান, অভিনয়, যন্ত্রপাতির কাজ, এসবকে আমরা শিক্ষা মনে করি না। কিন্তু কোন শিশু যদি বি-এ পাশ করার দিকে আগ্রহ না দেখিয়ে খেলায়, ছবি আঁকা বা নাচ বা এমন কি মাছ ধরার দিকে বেশী উৎসাহ দেখায়, তবে ছেলেটা উচ্ছন্নে গেল বলে নিজের বৃদ্ধ বয়সে কে খাওয়াবে তার দুশ্চিন্তায় আমরা অধীর হয়ে উঠি। বুঝিনা যে এসব দিকেও সে মস্ত বড় হ'য়ে পিতামাতার গর্বের কারণ হ'তে পারে। আমাদের বি-এ পাশ করানোর টানা-হেঁচড়ার চোটে সে হয়ত সব বাঁধন ছিঁড়ে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। তখন ভাল করে বুঝতে হবে, কি সে চায় বেশী, কোন্ দিকে তার আগ্রহ বেশী এবং সেই দিকে জ্ঞান ও উৎকর্ষ লাভের সুযোগ তাকে করে দিলে সমাজ বিরোধী না হয়ে সে সমাজের কল্যাণেই আসবে—চুরি করে জেলে না গিয়ে মাছের চাষ করেই হয়ত সে তার বুড়ো বাপ-মাকে খাওয়াতে পারবে এবং দেশে একটা গুরুত্বপুর্ণ শিল্প গড়ার কাজে সাহায্য করে দেশের উন্নতি করতে পারবে।

যখন দেখা যাবে যে, পারিপার্শ্বিকের দোষে শিশু খারাপ হয়ে

যাচ্ছে এবং তাকে তা থেকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টায় কোন ফল হ'চ্ছে না তখন পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন না করলে কিছুই হবে না। নতুন পারিপার্শ্বিকে গিয়ে শিশু যাতে তার পুরোনো গোষ্ঠীর সমজাতীয়দের খুঁজে নিয়ে নিজের পুরোনো সমাজ গড়ে না নেয়, তার জন্য সেখানে নিয়ে গিয়েই তাকে ভাল শিশু সমাজে ঢুকিয়ে দিতে হবে। মাঝে মাঝে সমুদ্র বা পাহাড় বা অন্য সুন্দর বা ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানে নিয়ে গেলে তা' শিশুমনের গলদ দূর করতে অনেকটা সাহায্য করে।

ভারতে শিশু কয়েদখানা ও সংশোধনালয়

সহজেই অনুমেয় যে, অপরাধ প্রবণ শিশুদের শোধরানো বাড়ীতে প্রায় সময়ই উপযুক্ত হয় না। মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টি, ধৈর্য ও সহনশীলতা না থাকলে একাজ করা সম্ভব নয়। বাড়ীর সকলে তাঁদের আচার ব্যবহার বদলে নেবেন এবং অপরাধ প্রবণ শিশুর সঙ্গে আচরণ সংযত ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে করবেন, এটাও আশা করা যায় না। তাছাড়া যে-পারিপার্শ্বিক শিশুকে অপরাধী বানিয়েছে, তার মনকে সুস্থ ক'রে তোলার পক্ষে তা একেবারে অনুকূল নয়। দেহের রোগের বেলায় বাড়ী অপেক্ষা হাসপাতালই চিকিৎসার পক্ষে উপযুক্ত স্থান। কারণ, হাসপাতালের আবহাওয়াই রোগ নিরাময়ের পক্ষে অনুকূল। কাছেই বড় বড় ডাক্তার ও ভাল নার্স থাকায় সব সময় রোগী ডাক্তারদের নজরে থাকে। মনের রোগের বেলায় এটা আরও খাটে। কারণ রোগগ্রস্ত-মনের উপরে প্রতিনিয়ত আঘাত বাড়ীতে এড়ান যায় না—এর জন্য উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক তৈরী করা দরকার যেখানে অপরাধী শিশুর মন বিশ্রাম নিতে পারবে। মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গও এই সব শিশুর প্রায় সর্বদা দরকার। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সংশোধনালয়। শিশুর মন স্বাভাবিক স্ফূর্তিলাভ করতে পারে—এমন জায়গা এই সংশোধনালয়। বাড়ীর ত্রুটিপূর্ণ স্নেহ ভালবাসা ও অন্য যে সব কারণ শিশুকে অপরাধ প্রবণ ক'রে তোলে তা এখানে থাকেনা।

আমাদের দেশে কিন্তু এর কোন সুব্যবস্থা নাই বললেই চলে। আছে কয়েকখানা শিশু কয়েদখানা বা খোয়াড়। এই সব জায়গায় শিশুকে কয়েদীর মত রাখা হয়। কয়েদীর মত তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। এবং কয়েদীর মতই তাদের খেতে দেওয়া হয় ও তাদের প্রতি ব্যবহার করা হয়। লঘু ও গুরু, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক, সাধারণ ও খুব খারাপ ধরনের অপরাধীকে একসঙ্গে রাখা হয়। ফলে পারিপার্শ্বিক হয় মারাত্মক রকমের সাংঘাতিক। একে অন্যের ঘাটতি পূরণ করে। এখানে এক একজন অত্যন্ত পাকা অপরাধী হয়ে কয়েদখানা থেকে বেরোয়। বলা চলে, যে সব অদ্ভুত কৌশলী সমাজ-বিরোধী লোক আমরা দেখতে পাই তাদের বেশীর ভাগ এই সব জায়গা থেকে ট্রেনিং পাওয়া।

যে সামান্য কয়টা শিশু-ব্যবহার সংশোধন কেন্দ্র আছে, সেখানে মনোবিজ্ঞানীর শিশুর বাপ-মাকে অপরাধ-প্রবণ শিশুদের শোধরান সম্পর্কে উপদেশ দিতে পারেন। কিন্তু আসল যেটা দরকার মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গ, সেটা শিশু এখান থেকে পায় না।

আরও কয়েকটা ছোটখাট শিশু-ব্যবহার সংশোধন নিবাসও আছে। কিন্তু এগুলির অধিকারে সেই উপযুক্ত মনোবিজ্ঞানী নাই বলে বিশেষ কোন কাজ হয় না। তা' ছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় যা আছে তা মরুভূমিতে বিন্দুর মত।

পৃথিবীর উন্নত সভ্য দেশগুলিতে কিন্তু এই বিষয়কে অন্য যে কোন অতি-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চাইতে কম ব'লে মনে করা হয় না। এবং তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতেও কার্পণ্য ও ত্রুটি করা হয় না। কারণ এর উপরে জাতীয় চরিত্র অনেকটা নির্ভর করে এবং বড় অবস্থায় যে সকল মানসিক বিকার দেখা যায়, অনেক সময় শিশু বয়সের অপরাধ প্রবণতার মধ্য দিয়েই তার উৎপত্তি হ'য়ে থাকে।

---

* প্রথম প্রকাশ, জুন—১৯৫২
দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল—১৯৫৫

* সম্পাদক
নির্মল চৌধুরী

* প্রকাশক
সলিল পাল
কিশোর কল্যাণ কেন্দ্র
১৩।২, কাঁটাপুকুর থার্ড বাই লেন
হাওড়া

* শিল্পী
রামকৃষ্ণ দত্ত
অরবিন্দ রায়

* মুদ্রক
শ্রীঅশোক কুমার মল্লিক
শ্রীদুর্গা প্রেস
২।৩ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী লেন
হাওড়া

* প্রাপ্তিস্থান
অশোক লাইব্রেরী
১৫।৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ ষ্ট্রীট)
কলিকাতা—১২

শিশু-লালনী গ্রন্থমালা ● শিশু-লালনী গ্রন্থমালা

প্রকাশিত পুস্তিকাবলী

১। শিশু ও শৈশব (দ্বিতীয় মুদ্রণ)
২। শিশু পালনে কোন্‌টী চাই—
বংশগতি না পারিপার্শ্বিক (দ্বিতীয় মুদ্রণ)
৩। আপনার শিশু কি লেখাপড়ায়
পিছিয়ে পড়ে ? (দ্বিতীয় মুদ্রণ)
৪। কিশোর ও কৈশোর (দ্বিতীয় মুদ্রণ)
৫। শিশু অপরাধ ও অপরাধী (দ্বিতীয় মুদ্রণ)
৬। শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন
৭। অবোধ শিশু
৮। ছোটদের খেলা ও খেলনা (যন্ত্রস্থ)

শিশু-লালনী  গ্রন্থমালা

প্রতিটির দাম
চার আনা মাত্র